প্রবন্ধ

জন্মভূমির ভিন্ন পাঠ : নেশন বনাম নো-নেশন বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ

বিনায়ক সেন

মোহ ও মোহভঙ্গ

শুরুটা হয়েছিল ভাষা দিয়েই, যেমন নেশনের উন্মেষপর্বে সচরাচর হয়। বেনেডিক্ট এন্ডারসনের 'কল্পিত সমাজ' ('কল্পিত' মানে 'অলীক' নয়) গড়ে ওঠে ভাষা-সাহিত্য ও প্রিন্ট-ক্যাপিটালিজমের মধ্য দিয়ে। সতেরো শতক থেকে নেশন প্রতিষ্ঠার এটাই ইতিহাস। ঠিক একই ছক মেনে বঙ্কিম আহ্বান জানিয়েছিলেন 'ইতিহাস লিখতে'। ভূদেব আরও এগিয়ে গিয়ে ইউটোপিয়াই লিখে ফেললেন, নাম দিলেন *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস*। রবীন্দ্রনাথও অচিরেই লিখবেন 'আত্মশক্তি' ও 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধমালা, যেখানে দাবি করা হবে প্রাচ্য সমাজের ভিন্ন গঠনসূত্র। কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলছি, সেটা আরও আগেকার কথা। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ২৪, কংগ্রেস সবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, সাল ১৮৮৫। বঙ্গ, বাংলা দেশ, বাঙালি—এদের পক্ষ হয়ে এদের উদ্দেশে কথা বলতে না পারলে তাঁর চিত্তবৃত্তি হয় না তখন। বাংলার বাইরের বিশ্বকে তিনি তখন দেখছেন বাঙালির চোখ দিয়ে :

> এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই? মানবসমাজকে আমাদের কি কোনো সংবাদ দিবার নাই? জগতের একতান সংগীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে!...দেশ-বিদেশ হইতে, অতীত-বর্তমান হইতে প্রতিদিন আমাদের কাছে মানবজাতির পত্র আসিতেছে; আমরা কি তাহার উত্তরে দুটি-চারটি চটি চটি ইংরেজি খবরের কাগজ লিখিব! সকল দেশ অসীম

কালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে, বাঙালির নাম কি কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকবে!...বহু বৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভাষায় একবার আপনার কথাটি বলিতে দাও। বাঙালি-কণ্ঠের সহিত মিলিয়া বিশ্বসঙ্গীত মধুরতর হইয়া উঠিবে। ('লাইব্রেরি', *বিচিত্র প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী*)

এই মোহদশা অবশ্য তার পরবর্তী দুই দশকে আস্তে আস্তে কেটে যাবে। তবে সেটা আরও কিছু মোহ জন্মানোর ও মোহভঙ্গের পর। কিন্তু এ পর্বেও লক্ষণীয়, তিনি 'জাতীয়' দাবির পরিমিতি রক্ষা করে চলেছেন। ইকবালের 'সারে জাহাঁসে আচ্ছা' বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সকল দেশের সেরা'—জন্মভূমির এমন পাঠে তাঁর কখনো সায় ছিল না। লেখেননি বটে, তবে চাইলে তখনো তিনি 'মাল্টিপল আইডেন্টিটি'র প্রতি পক্ষপাতিত্ব মেনে 'ভারততীর্থ' লিখতে পারতেন। নেশন নিয়ে মোহাচ্ছন্নতার পর্বেও তিনি বাড়াবাড়ির দিকগুলো এড়িয়ে চলেছেন। হিন্দু-মুসলমানসহ ভারতবর্ষের নানা সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক 'সমকক্ষতা'র ভিত্তিতে একটি 'মহা জাতি' গড়তে চেয়েছেন অন্য কোনো ভারতবর্ষীয় চিন্তকের চেয়ে অনেক বেশি আন্তরিকভাবে। যথার্থ মিলনের জন্য হিন্দু-মুসলমানের যুগ্ম নেতৃত্বের সঠিক রাজনৈতিক প্রস্তাব দিয়েছিলেন শুরুতেই—১৯০৫ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার এক বছর আগে (শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়ান থেকে জানা যাচ্ছে, কার্যত একই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল পরবর্তীকালে নেহরু-প্যাটেলকেও সাতচল্লিশের ভারত ভাগের আগে, তাঁরা রাজি হননি) :

> এখন হইতে আমরা হিন্দু ও মুসলমান, শহরবাসী ও পল্লিবাসী, পূর্ব ও পশ্চিম, পরস্পরের দৃঢ়বদ্ধ করতলের বন্ধন প্রতিক্ষণে অনুভব করিতে থাকিব।...এই অভিপ্রায়টি মনে রাখিয়া দেশের কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব—তাঁহাদের নিকটে নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব, তাঁহাদিগকে কর দান করিব; তাঁহাদের আদেশ পালন করিব, নির্বিচারে তাঁহাদের শাসন মানিয়া চলিব; তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া আমাদের দেশকে সম্মানিত করিব। ('অবস্থা ও ব্যবস্থা', *আত্মশক্তি, রবীন্দ্র রচনাবলী*)

ইউরোপীয় আদলে প্রথাগত নেশন গড়ার ছক মেনেই বলছেন এসব, কিন্তু নিজ দেশের সামাজিক সমস্যার বিশিষ্টতাকে মনে রেখে। যেকোনো সফল ন্যাশনালিজম এটাই করে থাকে। রবীন্দ্রনাথও তা-ই করতে চেয়েছিলেন গোড়ার দিকে, কিন্তু তাঁর প্রস্তাব মেনে পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ অগ্রসর হয়নি। সেই ১৯০৫ সালেই 'স্বদেশি সমাজ'-এর আন্দোলন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার

সিদ্ধান্ত নেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে (১৮৬৪-১৯১৯) লিখলেন :

> দেশে যদি বর্তমান কালে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা এবং ইঁহাদের প্রভাব অধিক থাকে, তবে আমাদের মতো লোকের কর্তব্য নিভৃতে যথাসাধ্য নিজের কাজে মনোযোগ করা।...উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটিকে জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব।[১]

বিশ্বসংলগ্ন যেমন, নিঃসঙ্গ কবিদেরও একজন ছিলেন তিনি। 'একলা চলো রে' বলে একাই পথচলার মানুষ। তাঁর নিঃসঙ্গতার মূল কারণ তাঁর একান্ত নিজস্ব নির্মাণের তত্ত্বীয় মতাদর্শ, যার অনুসারী তাঁর কালেও যেমন ছিল না, একালেও খুব বেশি নেই। কেননা, তাঁর আদর্শ বাঁধা মতের সীমানা অতিক্রম করে যায় এবং তা তাঁর সম্ভাব্য অনুসারীদের স্বস্তিবোধের তোয়াক্কা না করেই। ফলে 'নিভৃতে যথাসাধ্য নিজের কাজে মনোযোগ' দিলেন বটে পরবর্তীকালে, কিন্তু তত্ত্বগত লড়াইয়ের ক্ষেত্র ছেড়ে গেলেন না। এ লড়াইয়ের বড় অংশজুড়ে আছে নেশন, নেশন-স্টেট ও ন্যাশনালিজম নিয়ে তাঁর একান্ত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ক্রমবিবর্তন। এর নিকটতম তুলনা না পাওয়া যাবে বামপন্থী বৃত্তে, না পাওয়া যাবে ডানপন্থী বৃত্তে; মধ্যপন্থাতেও একে পাওয়া যাবে না। তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের নিকটতম তুলনা তিনি নিজে—ভারতবর্ষের বাইরে বিংশ শতকে এমন আর কেউ নেই—এ কথা দার্শনিক ইসাহ বার্লিন একটি লেখায় জানিয়েছেন।

প্রথাগত স্বদেশ-চিন্তা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে তিনি যে নিজেকে ক্রমেই গুটিয়ে নিচ্ছেন, তার পরোক্ষ ইঙ্গিত মেলে *গীতবিতান*-এও। 'স্বদেশ' পর্বে গানের সংখ্যা এত কম কেন, এ প্রশ্ন এর আগেও উঠেছে। স্বদেশ পর্বে গানের সংখ্যা মাত্র ৪৬টি, যেখানে প্রকৃতি পর্বে ২৮৩টি, প্রেম পর্বে ৩৯৫টি এবং পূজা পর্বে ৬১৭টি। এ ছাড়া (গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য ছাড়া) *গীতবিতান*-এ 'বিচিত্র', 'আনুষ্ঠানিক', 'পূজা-প্রার্থনা' ও 'প্রেম-প্রকৃতি' মিলিয়ে সংকলিত হয়েছে আরও ৩৬২টি 'বিবিধ' গান, যার মধ্যে একটাও গান নেই স্বদেশ-চিন্তাবিষয়ক। এই হিসাবে *গীতবিতান*-এ সংকলিত মোট গানের সংখ্যার মাত্র ২.৭ শতাংশ হচ্ছে 'স্বদেশ' পর্বের গান! প্রশ্নটা এ দেশের প্রখ্যাত এক রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীকে একটু ঘুরিয়ে করেছিলাম, 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর স্বদেশ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা এত কম কেন?' তাঁর উত্তর ছিল, 'তা কেন হবে, যা বলার সে তো বলা হয়েই গিয়েছিল। আবার নতুন করে স্বদেশ বিষয়ে গান লিখতে হবে কেন।' এই উত্তর শোনার পরও কিন্তু মনের 'খটকা' পুরোপুরি ঘোচে না। স্বদেশ বিষয়ে

রবীন্দ্রনাথের আর নতুন কিছু বলার ছিল না—এই অনুমান হয়তো অসংগত নয়। কিন্তু গান তো কেবল নতুন কিছু বলার তাগিদ থেকেই লেখা হয় না। ১৯১০-৪১ পর্বে যখন রাজনৈতিক আন্দোলন পরাধীন ভারতবর্ষে (এবং বাংলায়) তুঙ্গে উঠছিল সে পর্বে হয়তো স্বদেশ বিষয়ে নতুন কিছু বলতে চাননি রবীন্দ্রনাথ—হতে পারে; কিন্তু আলোড়ন যখন তুঙ্গে তখন পুরোনো কথাই আবার ফিরে বলার তাগিদ তৈরি হওয়াটাও অসম্ভব ছিল না। সে কারণেই স্বদেশ নিয়ে অল্প গান লেখার বিষয়টিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করারও সুযোগ থাকে। রবীন্দ্রনাথ কি ক্রমশ প্রথাগত স্বদেশ-চর্চায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলছিলেন? রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তখন বিভক্তির যে ধারায় অগ্রসর হচ্ছিল—আবুল মনসুর আহমদ যার একটি সত্যনিষ্ঠ বিবরণী রেখে গেছেন—তা আর তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি বলে? বিশেষভাবে তিনি বাংলা কংগ্রেসের রক্ষণশীলতায় ক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন বলে? ১৯০৫ সালে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে জানানো তাঁর মনোবেদনা—নিজেকে পথের ধারে রেখে দেওয়া—তাহলে কি সেই সংকেত ছিল তাঁর মনের চিরস্থায়ী সিদ্ধান্ত? অর্থাৎ যে যোগ দিতে চায় দিক, কোনোভাবেই তিনি আর নিজেকে ন্যাশনালিজমের বহ্নি উৎসবে জড়াবেন না; মাঝেমধ্যে দূর থেকে আন্দোলন-নির্যাতন উপলক্ষে আশীর্বাদলিপি পাঠানো ছাড়া।

১৮৮৫-১৯০৯ : নেশন-ভাবনার প্রথম পর্ব

একটা সময় ছিল—রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিচারণা করেছেন—'নেশন নই' বললে আমরা তেড়ে আসতুম। স্মৃতিচারণাটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক :

> মনে আছে, আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখন দেশে দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে একটা তর্ক প্রায় শোনা যেত, আমরা কি নেশন না নেশন নই। কথাটা সম্পূর্ণ বুঝতুম তা বলতে পারি নে, কিন্তু আমরা নেশন নই একথা যে মানুষ বলতো রাজা হলে তাকে জেলে দিতুম। সমাজপতি হলে তার ধোবা নাপিত বন্ধ করতুম। তার প্রতি অহিংস্র ভাব রক্ষা করা আমার পক্ষে কঠিন হতো। তখন এ সম্বন্ধে একটা বাধা তর্ক এই ছিল যে, সুইজারল্যান্ডে তিন ভিন্ন জাত পাশাপাশি রয়েছে। তবুও তো তারা এক নেশন, তবে আর কী! ('সমস্যা', *কালান্তর*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*)

দেখা যাচ্ছে, নেশন না হতে পারার অস্বীকৃতির মধ্যে এক প্রবল অপমানবোধ লুকিয়ে ছিল। যেন জগতের চোখে আমরা নেমে গেছি 'বর্বর' সম্প্রদায়ের দলে। নেশনের স্বীকৃতি পাওয়ার চেষ্টার মধ্য দিয়ে আত্মসম্মানবোধ (সেলফ-এসটিম) জাগ্রত হয়, এটাই ছিল নেশন হতে চাওয়ার নিগূঢ় কারণ। এত পতন-স্খলনের পরও এই আত্মসম্মানবোধের প্রয়োজনেই বুঝি একবিংশ শতাব্দীতে নেশনের

ভাবনা টিকে রয়েছে, এ রকম ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ। স্বদেশি সমাজ পর্বের লেখায় (যেমন—'আত্মশক্তি'র রচনায়) রবীন্দ্রনাথ এ রকম বলার চেষ্টা করেছেন যে আত্মসম্মানের স্বীকৃতির জন্যই নেশনকে গড়ে তোলা দরকার। ফরাসি মনীষী রেনার ছক ধরে বোঝার চেষ্টা করেছেন, ইউরোপ যে প্রয়োজনে 'নেশন' হয়েছে, সেভাবে আমরাও নেশন হতে পারি তবে ভিন্ন ধারায়। এর জন্য আগেই বলেছি, হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ঐক্যের ভিত্তিতে (দুই সম্প্রদায় থেকে দুই অধিনায়ককে নিয়ে) এক 'মহা জাতি' নির্মাণের প্রস্তাব ছিল তাঁর। বস্তুত, স্বদেশি সমাজের সংবিধানও রচনা করেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের এ ভাবনাকে কেউ বিকল্প নেশন তৈরির প্রকল্প ভাবতে পারেন। পার্থ চ্যাটার্জি অবশ্য বলবেন যে প্রতিটি জাতীয়তাবাদই নিজেকে ব্যতিক্রমী ভিন্ন উৎস বলে দাবি করে, যদিও কালক্রমে তাদের স্বভাব-চরিত্র ও পরিণতি একই দিকে গড়ায়। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবা আধুনিক ন্যাশনালিজমের একটি 'মডিউলার ফর্ম' মাত্র। যা হোক, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের নেশন-ভাবনার গোড়ার পর্ব। কালনিরিখে এ পর্বের শুরু 'বিবিধ' প্রবন্ধ দিয়ে এবং এর সমাপ্তি হয় ১৯১০ সালের দিকে *গোরা* উপন্যাস প্রকাশের মধ্য দিয়ে। জমিদার বনাম কৃষক, হিন্দু বনাম মুসলমান, ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায় বনাম নিরক্ষর লোকসাধারণ—এই ত্রিবিধ সামাজিক বিভক্তিকে জিইয়ে রেখে 'ওপর থেকে' নেশনের রাজনৈতিক ঐক্য ও নেশন নির্মাণ সম্ভব নয়। এটাই ছিল তাঁর অনাস্থার প্রধান কারণ। সামাজিক বিভাজন এসে নেশনের মানসিক ঐক্যের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের এ ভাবনার বিশিষ্টতা নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছে। সামাজিক এ বিভাজন শুধু জমিদার-কৃষক দ্বন্দ্বের অর্থনৈতিক শ্রেণীগত ফারাক থেকে উদ্ভূত হয়নি, যেটা ঘটেছিল ইউরোপে। এর মধ্যে জড়িয়ে আছে সম্প্রদায়গত অবহেলা, যে কারণে লিখেছেন বহুবার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিবেশীসুলভ 'মনুষ্যোচিত' সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা পায়নি, এ নিয়ে দুয়ের মধ্যে বহুদিন থেকে 'একটা পাপ চলিয়া আসিতেছে' এবং এটা 'ধর্মবিহিত'ও নয়।[২] আর একই সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিতে-অশিক্ষিতের সামাজিক ব্যবধান এমনই যে, আমরা 'এক দেশে থাকিলেও' এক দেশে নেই। এ ব্যবস্থায় শিক্ষিতরা যদি রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনে অশিক্ষিতের দ্বারস্থ হয়, তবে শেষোক্তজনেরা বলাবলি করতে শুরু করে, 'বাবুরা বোধকরি বিপদে পড়িয়াছে', নইলে তাদের শহর ছেড়ে তো গাঁওগেরামে আসার কথা নয়! এটা শুধু তত্ত্বগত যুক্তির কথাই ছিল না; প্রজাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে ধর্ম ও বর্ণের ভেদ রবীন্দ্রনাথের জন্য বাস্তবিকই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি।

কিন্তু এখানেও রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মতের একটি বিশেষত্ব হলো যে

গোড়ার পর্বেও তিনি কোথাও জাতীয়তাবাদ শব্দটি ব্যবহার করেননি। চিরকাল তিনি ইংরেজি নেশন ও ন্যাশনালিজম শব্দই ব্যবহার করেছেন বাংলা শব্দ জাতি বা জাতীয়তাবাদ ব্যবহারের বিপরীতে। সেটা এ কারণে নয় যে যথার্থ বঙ্গানুবাদ তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। এটা তিনি সচেতনভাবেই করেছিলেন। 'নেশন কী' প্রবন্ধে স্পষ্ট করে বলছেন :

> নেশন শব্দটা অবিকৃত আকারে গ্রহণ করিতে আমি কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করি না। ভাবটা আমরা ইংরেজের কাছ হইতে পাইয়াছি, ভাষাটাও ইংরেজি রাখিয়া ঋণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। উপনিষদের ব্রহ্ম, শংকরের মায়া ও বুদ্ধের নির্বাণ শব্দ ইংরেজি রচনায় প্রায় ভাষান্তরিত হয় না এবং না হওয়াই উচিত। ('নেশন কী', *আত্মশক্তি*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*)

লক্ষণীয় যে এ পর্যায়ের রচনায় তিনি কিন্তু ইংরেজের কাছ থেকে প্রাপ্ত 'ভাব'-এর ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন না। ভাবটা খারাপ নয়, বরং তার প্রয়োগ-সম্ভাব্যতা নিয়ে তিনি বেশি চিন্তিত। 'তাহাদের নেশন'-এর বিপরীতে 'আমাদের নেশন' কীভাবে গড়ে উঠতে পারে, এ নিয়ে তিনি নানা ধরনের সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছেন 'স্বদেশি সমাজ' প্রবন্ধে। তবে তাঁর মনে সন্দেহ ক্রমেই দানা বাঁধছে। বিকল্প জাতি নির্মাণ ও ইউরোপীয় ছকে সন্দেহ দুটোই পাশাপাশি চলছে গোড়ার পর্বের লেখায়। নইলে ফরাসি মনীষী গিজোর নেশন প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্র ধরে 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধমালায় হঠাৎ করে বলে বসতেন না, 'নেশনই যে সভ্যতার অভিব্যক্তি তাহার চরম পরীক্ষা হয় নাই।' অন্তত ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার নিরিখে তাঁর কাছে মনে হচ্ছে, নেশনের 'চারিত্র-আদর্শ উচ্চতম নহে। তাহা অন্যায়-অবিচার ও মিথ্যার দ্বারা আকীর্ণ এবং তাহার মজ্জার মধ্যে একটি ভীষণ নিষ্ঠুরতা আছে।' কিন্তু প্রাচ্য সভ্যতার নেশন ভিন্ন ছকের সন্ধান দিতে পারে, তখনো তিনি বোধ হয় এই আশা করছিলেন। জীবনের শেষ ৩০ বছরে তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গি আমূল বদলে যায়।[৩]

১৯১০-১৯৪১ : নেশন-ভাবনার দ্বিতীয় পর্ব

এই পর্বে নেশনের ভাবটিকেই তিনি প্রশ্ন করতে শুরু করেন। নেশন নির্মাণ করতে গিয়ে তখন মনে হতে থাকে, এ তো দেবতার নয়, অপদেবতার পুজো করা হচ্ছে। ইংরেজিতে চিহ্নিত করেছেন একে 'ভৌগোলিক অপদেবতা' (জিওগ্রাফিক্যাল ডেমন) বলে, যার বেদিতে বলি হচ্ছে সাধারণ মানুষ। এই অপদেবতা শুধু নিজেদের মধ্যে মহাযুদ্ধই বাধায়নি, এমনকি পরাধীন ভারতবর্ষেও সৃষ্টি করেছে কংগ্রেস-মুসলিম লীগে, হিন্দু-মুসলমানে, উচ্চবর্ণে-নিম্নবর্ণে তপ্ত বিভক্তি। ১৯১০ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত রচনাগুলো নেশনের ভেতরের ফাটল বা বিভক্তি রেখাকে

(ফল্টলাইন) নানাভাবে দেখিয়েছে—কখনো *ন্যাশনালিজম* প্রবন্ধগুচ্ছে, কখনো *গোরা* বা *ঘরে বাইরে* উপন্যাসে, কখনো *রক্তকরবী*, *তাসের দেশ* বা *মুক্তধারা* নাটকে। *কালান্তর*-এ সংগৃহীত এ পর্বের বেশ কিছু প্রবন্ধ এই বিভক্তি রেখার সাক্ষী। পরবর্তী যুগের পার্থ চ্যাটার্জির *নেশন অ্যান্ড ইটস ফ্র্যাগমেন্টস*, আশিস নন্দীর *দ্য ইললেজিটিমেসি অব ন্যাশনালিজম* বা অতি সাম্প্রতিকের জয়া চ্যাটার্জির *বেঙ্গল ডিভাইডেড*—এসব পোস্ট-কলোনিয়াল ডিসকোর্স বা তার আদি যুক্তিগুলো রবীন্দ্রনাথের এ পর্বের রচনায় পূর্বনির্মিত হচ্ছে।

গোড়ার পর্বে রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন 'নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ'। অর্থাৎ এটি কোনো কলের যন্ত্র নয়, বরং বৃহত্তর ঐক্যের স্বাভাবিক গঠনপ্রণালি, যার ভেতরে বিভিন্ন সম্প্রদায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকে, তা জাতি-ধর্ম যা-ই হোক না কেন। কেননা, এ সহাবস্থানের পেছনে রয়েছে যেমন 'সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতি সম্পদ', তেমনি রয়েছে 'পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা—অখণ্ড উত্তরাধিকার হস্তগত হইয়াছে তাহাকে উপযুক্তভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা'। সংজ্ঞাটা পুরোপুরি বদলে গেল *ন্যাশনালিজম* প্রবন্ধগুচ্ছে এসে। এবার দেখা গেল, নেশন আর কোনো সজীব সত্তা নয়, বরং নেশন হচ্ছে সেই অস্বাভাবিক অবস্থা, যা গোটা জনসাধারণকে 'যান্ত্রিক প্রয়োজনে' সংঘবদ্ধ করে (আ নেশন ইজ দ্যাট আসপেক্ট হুইচ আ পপুলেশন এসিউমস হোয়েন অর্গানাইজড ফর আ মেকানিক্যাল পারপাস)। আর যান্ত্রিক প্রয়োজনটা কার? না, স্বার্থপরতার। ব্যক্তিস্বার্থপরতার চেয়ে আরও বড় সংঘবদ্ধ স্বার্থপরতার। বেশ খটোমটো সংজ্ঞাটি সন্দেহ নেই। কিন্তু যান্ত্রিক (কল) শব্দটা লক্ষ করার, কেননা কলের স্বভাবের তুলনাতেই এখন থেকে নেশন ও তার অর্গানাইজেশন তিনি দেখতে থাকবেন। নেশন সভ্যতার সুউচ্চ প্রকাশ নয়, বরং তার বিনাশের আগের ধাপ। এ যেন 'সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের শেষ স্তর' এর সমান্তরাল একটি টেক্সট। সন্দেহ কী যে *ন্যাশনালিজম* বইটি স্থান পাবে লেনিনের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে। শুধু স্থানই পাবে না, পরবর্তী সময়ে চিন্মোহন সেহানবীশ মনে করিয়ে দেবেন যে বইটির পাতায় কিছু মন্তব্যও লিখেছেন লেনিন। পরবর্তী সময়ে কমিন্টার্নে ন্যাশনালিজমের প্রশ্নে লেনিন বামপন্থীদের সতর্ক করে দেবেন এর সাম্রাজ্যবিরোধিতাকে 'লাল রঙে' না দেখতে।

ন্যাশনালিজম গ্রন্থের তিনটি প্রবন্ধ যথাক্রমে লেখা আমেরিকা, জাপান ও ভারতে 'জাতীয়তাবাদ'-এর প্রকাশ কীভাবে অমানবিক রূপ ধারণ করেছে তা নিয়ে। এ তিন দেশের কোথাও রবীন্দ্রনাথের ন্যাশনালিজমবিরোধী ভাবনা সমাদৃত হয়নি, এ কথা সুবিদিত। সম্প্রতি চীনে *ন্যাশনালিজম* বইটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে

পার্থ চ্যাটার্জি যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তাতে জানিয়েছেন যে চীনের সুন-ইয়াৎ-সেনপন্থীরাও একে সুনজরে নেয়নি। কারণটা ব্যাখ্যা করেছেন চীনা বিশেষজ্ঞ জেপিং। তাঁর মতে, সুন-ইয়াৎ-সেন তাঁর *দ্য থ্রি প্রিন্সিপলস অব দ্য পিপল* বইয়ে বলেছেন তিনটি স্তম্ভের কথা, স্তম্ভগুলো হচ্ছে যথাক্রমে : ন্যাশনালিজমের নীতি, জনগণের সার্বভৌমতার নীতি ও জনগণের জীবনমানের নীতি। ন্যাশনালিজম সুন-ইয়াৎ-সেনের জন্য জরুরি বিদেশি সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করার প্রয়োজনে। এর বিপরীতে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ন্যাশনালিজম হচ্ছে অবিমিশ্র অমঙ্গল কেবল, এমনকি এর যা কিছু আপাতদৃষ্টিতে মঙ্গলকর, তা-ও পরিণামে কেবল অমঙ্গলই ডেকে আনে। এর মূল কারণ, ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদীরা রাজনৈতিকভাবে যতই প্রগতিশীল হোক না কেন, সামাজিকভাবে তারা রক্ষণশীল। সমাজের মধ্যে বিভক্তি জিইয়ে রেখে 'ওপর থেকে' ন্যাশনালিজমের ঐক্যবন্দনা ভেঙে যেতে বাধ্য। এ সমস্যা আমাদের দেশের জন্য আরও প্রবল ইউরোপের তুলনায়। এর কারণ তিনি *কালান্তর*-এর 'সমস্যা' প্রবন্ধে বিস্তৃত করেছেন। সেখানে তাঁর মূল কথা হলো, ইউরোপে শাসিত ও শাসয়িতা দুই দলের মধ্যে যে ভেদ ঘটেছিল তা 'জাতিগত ভেদ নয়, শ্রেণীগত ভেদ' (এখানে ইংরেজি রেস অর্থে জাতি শব্দটি ব্যবহার করছেন রবীন্দ্রনাথ)। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে জাতিভেদ-ধর্মভেদ এক প্রবল সমস্যা এবং সে কারণে ভেদের প্রকৃতি বিচারে দাওয়াইও এখানে ইউরোপের তুলনায় ভিন্ন হতে হবে। একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি হলেও কেন রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় ঘরানার ন্যাশনালিজম আমাদের জন্য যথার্থ আশ্রয় নয় বলে ভেবেছিলেন তা স্পষ্টতর হয় :

> বিধাতার পরীক্ষাশালায় সব পরীক্ষার্থীর একই প্রশ্ন নয়। ভেদ এক রকম নয়। এক পায়ে খড়ম আর-এক পায়ে বুট, সে এক রকমের ভেদ; এক পা বড়ো আর-এক পা ছোটো, সে আর এক ভেদ; পায়ের হাড় ভেঙে গিয়ে পায়ের এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের বিচ্ছেদ, সে অন্য রকমের ভেদ; এই সব-রকম ভেদই স্বাধীনশক্তিযোগে চলাফেরা করায় বাধা দেয়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভেদের প্রতিকার ভিন্ন রকমের।...একদা ইংরেজ জাতের মধ্যে ভেদের যে ছিন্নতা ছিল সেটাকে একটা রাষ্ট্রনৈতিক সেলাইয়ের কল দিয়ে তারা পাকা করে জুড়েছে। কিন্তু যেখানে কাপড়টা তৈরিই হয়নি, সুতোগুলো কতক আলাদা হয়ে কতক জটা পাকিয়ে পড়ে আছে, সেখানে রাষ্ট্রনৈতিক সেলাইয়ের কলের কথা ভাবাই চলে না, সেখানে আরও গোড়ায় যেতে হয়, সেখানে সমাজনৈতিক তাঁতে চড়িয়ে বহু সুতোকে এক অখণ্ড কাপড়ে পরিণত করা চাই। তাঁতে বিলম্ব হবে, কিন্তু সেলাইয়ের কলে কিছুতেই বিলম্ব সারা যায় না।

এর থেকে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ সামাজিক মৈত্রীকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের

পূর্বশর্ত হিসেবে দেখেছিলেন। এ বিষয়ে কোনো ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না তিনি। বিরুদ্ধ পক্ষ রাজনৈতিকভাবে যত প্রবলই হোক না কেন, তাঁর সাফ কথা, 'স্বরাজ হাতে পেলে আমরা স্বরাজের কাজ নির্বাহ করতে পারব, তার পরিচয় স্বরাজ পাবার আগেই দেওয়া চাই।' এ ক্ষেত্রে স্বরাজ মানে ব্যবহারিক অর্থে সরকার চালানোর ক্ষমতা বোঝানো হচ্ছে না। স্বরাজ মানে অর্থনীতিতে যে অর্থে ইমপোর্ট-সাবস্টিটিউশন বোঝানো হয়ে থাকে, সে রকম কোনো ইঙ্গিত নেই এতে। রবীন্দ্রনাথের উদারনৈতিক-অর্থনৈতিক চিন্তায় অটার্কির কোনো স্থান ছিল না। অন্যত্র তিনি স্পষ্ট করেই বলছেন, 'পৃথিবীতে স্বরাজী এমন কোনো দেশই নেই' যে 'অন্য দেশের আমদানি জিনিস বহুল পরিমাণে ব্যবহার না করে'। তাঁর স্বরাজ এক গতিশীল সমাজের ধারণা ব্যক্ত করে। সেখানে আমদানি-রপ্তানি চলছে, তবে সেটা 'কেবল বণিকের মতো পণ্য-উৎপাদনে নয়, বিদ্যা-অর্জনে, বুদ্ধির আলোচনায়, লোকহিতে, শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টিতে, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশে'। কেউ বলতে পারেন, এত চরম পূর্বশর্ত রাখার প্রয়োজন রয়েছে কি? আগে রাজনৈতিকভাবে বিদেশি শক্তির কাছে পরাধীনতার কবল থেকে মুক্ত হই, পরে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ করা যাবে! আমরা এভাবে ভাবতে পারি, কিন্তু তাতে রবীন্দ্রনাথের সায় ছিল না। 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' প্রবন্ধে শচীন্দ্রনাথ সেনের *পলিটিক্যাল ফিলসফি অব রবীন্দ্রনাথ* বইয়ের আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন :

> আগে বাহিরের বাধা দূর হবে, তারপরে আমাদের দেশ-প্রীতি অন্তরের বাধা ভেদ করে পরিপূর্ণ শক্তিতে দেশের সেবায় নিযুক্ত হবে, এমন আত্মবিড়ম্বনার কথা আমরা যেন না বলি। যে মানুষ বলে, 'আগে ফাউন্টেন পেন পাব তার পরে মহাকাব্য লিখব' বুঝতে হবে তার লোভ ফাউন্টেন পেনের প্রতিই, মহাকাব্যের প্রতি নয়। যে দেশাত্মবোধী বলে, 'আগে স্বরাজ পেলে তারপরে স্বদেশের কাজ করব' তার লোভ পতাকা ওড়ানো উর্দি পরা স্বরাজের রং করা কাঠামোর পরেই। স্বরাজ আগে আসবে, স্বদেশের সাধনা তার পরে, এমন কথাও তেমনই সত্যহীন এবং ভিত্তিহীন এমন স্বরাজ।

রবীন্দ্রনাথের এমন চরম দাবির সঙ্গে তাঁর কালের (এবং পরবর্তীকালের) জাতীয়তাবাদীরা সহমত হননি। আগে নড়বড়ে সামাজিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে হলেও রাজনৈতিক স্বরাজ বা স্বাধীনতা চাই, তারপর অন্যান্য দিকে মুক্তচর্চা হবে, এটাই হচ্ছে সঠিক রাজনৈতিক কৌশল, যা রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারছেন না বা বুঝতে চাইছেন না, এটাই ছিল তাঁদের মত। কেন তিনি তার পরও নিজের বিশ্বাসে অনড় ছিলেন, সে প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে। আমার ধারণা, প্রবল জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, ধর্মভেদের দুর্বল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে নেশন গড়ার আন্দোলন গড়লে তা এসব ভেদবুদ্ধিকেই আরও বাড়িয়ে তুলবে, এ রকম কোনো বাস্তব

আশঙ্কা তাঁর মনের মধ্যে কাজ করছিল।[৪] সামাজিক বিভেদের ওপর দাঁড়িয়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সফল হবে না বা হলেও সে সফলতা ক্ষীণ হয়ে যেতে পারে নিজেদের মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধে। ইংরেজ চলে গেলে আমরা গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পরস্পর সংহারে লিপ্ত হতে পারি এবং সে ক্ষেত্রে ন্যাশনালিজম মতাদর্শ হিসেবে বরং সংহারস্পৃহাকেই উসকে দেবে, তা নিয়ে তাঁর দুর্ভাবনার শেষ ছিল না। 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধের শেষ স্তবকে সেই আশঙ্কা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত। একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি, কিন্তু কেন এত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ সামাজিক ঐক্যের বাইরে ন্যাশনাল ঐক্য মেনে নিতে চাননি, তা বুঝতে সহায়ক হয় :

> ধরে নেওয়া গেল গোল বৈঠকের পরে দেশের শাসন-ভার আমরাই পাব। কিন্তু দেশটাকে হাত ফেরাফেরি করার মাঝখানে একটা সুদীর্ঘ সন্ধিক্ষণ আছে। সিভিল সার্ভিসের মেয়াদ কিছুকাল টিকে থাকতে বাধ্য। কিন্তু সেইদিনকার সিভিল সার্ভিস হবে ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো। মন তার গরম হয়ে থাকবার কথা। সেই সময়টুকুর মধ্যে দেশের লোক এবং বিদেশের লোকের কাছে কথাটা দেগে দেগে দেওয়া তার পক্ষে দরকার হবে যে, ব্রিটিশরাজের পাহারা আলগা হবামাত্রই অরাজকতার কালসাপ নানা গর্ত থেকে বেরিয়ে চারি দিকেই ফণা তুলে আছে, তাই আমরা স্বদেশের দায়িত্ব-ভার নিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।...সেই যুগান্তরের সময়ে যে যে গুহায় আমাদের আত্মীয়বিদ্বেষের মারগুলো লুকিয়ে আছে সেই সেইখানে খুব করে খোঁচা খাবে। সেইটি আমাদের বিষম পরীক্ষার সময়। সে পরীক্ষা সমস্ত পৃথিবীর কাছে। এখন থেকে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত থাকতে হবে যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টির সামনে মূঢ়তায় বর্বরতায় আমাদের নতুন ইতিহাসের মুখে কালি না পড়ে।

ওপরের লাইনগুলো যখন লেখা হচ্ছে, তখন ১৯৩১ সাল—গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে লন্ডনে। তখনই রবীন্দ্রনাথ সশঙ্কিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার (এবং তা সঠিক পথে না এগোলে দেশভাগের) পরিণতি ভেবে। বিশেষত, তিনি সশঙ্কিত বঙ্গদেশ নিয়ে, যেখানে 'আমরা আছি জতুগৃহে, আগুন লাগাতে বেশিক্ষণ লাগে না'। তখনই তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন 'শান্ত মনে বুদ্ধিপূর্বক পরস্পরের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের উপায়' উদ্ভাবনের জন্য এবং মনে করিয়ে দিচ্ছেন, যদি এই সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট না অর্জিত হয়, 'বাঙ্গালি-প্রকৃতি-সুলভ হৃদয়াবেগের ঝোঁকে যদি কেবলই জেদ জাগিয়ে স্পর্ধা পাকিয়ে তুলি, তা হলে আমাদের দুঃখের অন্ত থাকবে না'। এক অর্থে রবীন্দ্রনাথ সৌভাগ্যবান, সাতচল্লিশের স্বাধীনতার আগে-পরের দাঙ্গা—আশিস নন্দীর ভাষায় জাতি নিধনের আধুনিক 'হলোকাস্ট'—তাঁকে দেখতে হয়নি।

কেন, বিশেষ করে বিভাগপূর্ব বাংলাকেই তাঁর জতুগৃহ মনে হয়েছিল;

সেটাও ভেবে দেখার। মোট কথা, নেশন বা ন্যাশনালিজমের সমালোচনা কেবল পুঁথির পাতা বা তত্ত্ববিচার থেকে উৎসারিত হয়নি (তত্ত্বজ্ঞানী তিনিও ছিলেন); নেশনের সমালোচনার পেছনে ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং এর সামাজিক জীবনে জাতিগত, সম্প্রদায়গত, ধর্মগত ভেদ, অবহেলা ও পীড়ন সম্পর্কে তিক্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও।

অনাধুনিক নাকি উত্তর-আধুনিক?

'রাবীন্দ্রিক নেশন কী' প্রবন্ধে পার্থ চ্যাটার্জি কয়েকটি গুরুতর আপত্তি তুলেছেন আজকের যুগে রবীন্দ্রনাথের নেশন-ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে। তাঁর প্রধান যুক্তি হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ যে নেশনকে সমালোচনা করেছেন, তা আঠারো-উনিশ শতকে উদ্ভূত নেশন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন ইউরোপ-আমেরিকার কোনো দেশে সর্বজনীন ভোটাধিকার চালু হয়নি। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের' যে ধারণা ইউরোপে চালু হয়, সেটি তিনি দেখে যেতে পারেননি। এই কল্যাণমুখী রাষ্ট্র কেবল দমনপীড়ন যন্ত্রের সাহায্যে সমাজের ওপরে তার আধিপত্য বিস্তার করে না। নির্বাচনী গণতন্ত্রের ওপর ভর করে এটি ক্ষমতার এমন একটি মায়াবী 'তন্ত্র' কায়েম করে (যেমন, উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে), যার দ্বারা তার ক্ষমতা ন্যায্যতা পায়। এমনকি ভারতবর্ষেও ১৯২০-এর দশক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক উদ্যোগে কংগ্রেস পার্টি বেশ কিছু জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি হাতে নিতে শুরু করে (যেমন, পরিকল্পনা, চরকা কাটা, বুনিয়াদি শিক্ষা, জাতীয় বিদ্যালয়, বন্যা-ত্রাণ, খরা-ত্রাণ ইত্যাদি), যাকে ভিত্তি করেই স্বাধীনতার পর ভারতে (এবং অন্যত্র) জনকল্যাণের চেহারা নিয়ে মঞ্চে আবির্ভূত হয় উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। অর্থাৎ ফুকো যাকে বলেছেন 'গভর্নমেন্টালিটি' (পার্থ চ্যাটার্জি যার অনুবাদ করেছেন 'সর্বজনীন প্রশাসনিকতা'), তার সুবাদে নেশন-স্টেটের ন্যায্যতা জনগণের কাছে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চলে। নেশন-স্টেট তখন গণতন্ত্রের এই পরিবেশে আর নিরঙ্কুশ অমঙ্গলের উৎস বলে প্রতিভাত হয় না। এসব বলে পার্থ চ্যাটার্জি সিদ্ধান্ত টানেন, 'আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্রের খুঁটিনাটি নিয়ে' রবীন্দ্রনাথ 'মোটের ওপর নিরুৎসাহ ছিলেন। যেহেতু তাঁর কাছে তা শুধুই যন্ত্র, তাকে বোঝার প্রবৃত্তি বা ধৈর্য তাঁর ছিল না। এ কারণে তাঁর সমাজচিন্তা আজ আমাদের কাছে বহুলাংশে অবান্তর হয়ে এসেছে।'

তা ছাড়া যে নৈতিক সমালোচনার ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ নেশনের ধারণাকেই 'খারিজ করে দিচ্ছেন', তারও গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়। কেননা, বিংশ শতকের শেষে এসে আধুনিক মানুষের 'নৈতিক জীবনও আকীর্ণ হয়ে আছে বিচিত্র

ছলনাজালে'। সাদায়-কালোয় বিভক্তি আজ আর স্পষ্ট নয়। সেটা দুই কারণে। প্রথমত, আজকের শাসকেরাও বিভিন্ন ধরনের কূটকৌশল আশ্রয় করেন। 'আজকের দুনিয়ায় এমন কোনো শাসনযন্ত্র নেই যা শুধুই মঙ্গল করে, অমঙ্গল করে না অথবা শুধুই অমঙ্গল করে, এতটুকুও মঙ্গল করে না। সুতরাং, রাষ্ট্রনীতির সত্য নিতান্তই স্ট্র্যাটেজিক সত্য, তা অনিত্য, আপেক্ষিক, নিজের পরিমণ্ডলের গণ্ডিতে বাঁধা, তা জটিল, কূট।' কৌটিল্যের চেয়েও কূটচালে 'অর্থশাস্ত্র' প্রয়োগ করেন আধুনিক রাষ্ট্রনায়কেরা। দ্বিতীয়ত, জনগণও দেনা-পাওনার রাজনীতিতে ক্রমেই অভ্যস্ত হয়ে উঠছে, 'সাধারণ মানুষ রাষ্ট্র, প্রশাসন, উন্নয়নব্যবস্থা, বাজার-অর্থনীতি, এনজিও—এসব বিষয় নিয়ে শুধু যে অবহিত তা-ই নয়, এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লেনদেন করার জন্য, তা কিছু পাওয়ার জন্যই হোক কিংবা তাদের ঠেকিয়ে রাখার জন্যই হোক, অত্যন্ত জটিল ও কূট স্ট্র্যাটেজির সাহায্য নেয় সাধারণ মানুষেরা।' এসব ধারণায় পার্থ চ্যাটার্জি যেমন ব্যবহার করছেন মিশেল ফুকোর ক্ষমতাবিষয়ক সংলাপ, তেমনি অনুমিত হচ্ছে জেমস স্কটের নিম্নবর্গের মানুষের নীরব প্রতিরোধ কৌশলের তত্ত্ব। মোদ্দা কথা, নেশন ও নেশন-স্টেটের রবীন্দ্রনাথকৃত সমালোচনার সেন্টিমেন্টাল মূল্য কারও কারও কাছে থাকতে পারে—বাস্তবতার স্বীকৃতি নেই সেখানে। আজকের গণতন্ত্রের পরিবেশে প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেখানে 'সাধারণ আর গড়পড়তার মঙ্গল করতে ব্যস্ত', সেখানে নেশন-স্টেটের ধারণা খারিজ করে কার্যত রবীন্দ্রনাথ তাঁর চূড়ান্ত আইডিয়ালিস্ট মনের সরলতার (নাইভিটি) পরিচয় দিচ্ছেন এবং এ কারণে রবীন্দ্রনাথের নেশন-সমালোচনা আধুনিক যুগের ক্ষমতাতন্ত্র, নেশনব্যবস্থা, গণতন্ত্র, সর্বজনীন প্রশাসনিকতা—এককথায় নেশনের প্রতি চলমান আনুগত্যকে বুঝতে সাহায্য করে না। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অপ্রাসঙ্গিক এবং এই অপ্রাসঙ্গিকতার উৎসস্থল হচ্ছে সময়ের সঙ্গে নেশন-স্টেটের চরিত্র বদলে গেছে অনেকটাই। রবীন্দ্রনাথ এই ভিন্ন সময়ের পাঠ করতে পারেননি এবং সে অর্থে তিনি অনাধুনিক। এভাবেই পার্থের সমালোচনাকে সারসংক্ষেপ করলে অত্যুক্তি হয় না।

অথচ কী আশ্চর্য, রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মতের সপক্ষে বিংশ শতকের শেষে এসে অন্য মতও আমরা পাচ্ছি। ইংরেজ মার্ক্সবাদী দার্শনিক ই পি থম্পসন রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি-বিরোধিতার মধ্যে 'পোস্ট-মডার্নিজম' খুঁজে পেয়েছেন (যার সাক্ষ্য রয়েছে ১৯৯১ সালে *ন্যাশনালিজম* বইয়ের পুনর্মুদ্রণের ভূমিকায়)। আশিস নন্দী রবীন্দ্রনাথের নেশনবিরোধী সমালোচনায় খুঁজে পাচ্ছেন 'স্টেটবিরোধী এক মতাদর্শ, যাতে স্বদেশপ্রেমের জায়গা আছে কিন্তু ন্যাশনালিজমের নেই'। ইংরেজ উদারনৈতিক দার্শনিক ইসাহ বার্লিন আরও একধাপ এগিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখছেন এক 'দুঃসাধ্য মধ্যপন্থার' সাধনায় একাকী পথ চলতে। একদিকে

পাশ্চাত্যমুখিনতার ধারা এবং অন্যদিকে ঐতিহ্যমুখিনতার ধারা—এ দুইয়ের মধ্যে অনেকটা রজ্জুপথে চলে নিজস্ব একটি মত দাঁড় করিয়েছেন তিনি। 'রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর অ্যান্ড দ্য কনশাসনেস অব ন্যাশনালিটি' প্রবন্ধে বার্লিন বলছেন :

> [Tagore] never showed his wisdom more clearly than in choosing the difficult middle path, drifting neither to radical modernism, nor to proud and gloomy traditionalism. Not to give way at a critical point to the temptation of exaggeration–some dramatically extremist doctrine which rivets the eyes of one's own countrymen and the world, and brings followers and undying fame and a sense of glory and personal fulfillment–not to yield to this, but to seek to find the truth in the face of scorn and threats from both sides–left and right, Westernisers and traditionalists–that seems to me the rarest form of heroism.

দেখা যাচ্ছে, বার্লিনের চোখে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মতে আধুনিকতার কোনো ঘাটতি নেই, বরং আছে এক অবিমিশ্র শ্রদ্ধাবোধ। কেননা, তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সমকক্ষতার ভিত্তিতে সামঞ্জস্য খুঁজছেন, পরিহার করছেন এককেন্দ্রিকতা, সমন্বয় করছেন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের পাশাপাশি জ্ঞানবিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের সমকক্ষ হওয়ার অধিকার। এ চাওয়া দুর্বলের নয়, আত্মবিশ্বাসে সামর্থ্যবান সবলের।

বার্লিন উদারনৈতিক দার্শনিক—তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগকে প্রশংসার চোখে দেখেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় বৃহত্তর বোঝাপড়ার ভাষা বুঝতে তিনি অক্ষম। পার্থ চ্যাটার্জি রবীন্দ্রনাথকে বলছেন আধুনিক অর্থে অপ্রাসঙ্গিক, অন্যদিকে ইসাহ বার্লিন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন এক শ্রেয়তর রাষ্ট্রনৈতিক সমাধান। তাঁরা উভয়ই এই তত্ত্বদর্শীর রচনাগুলোকে অনেকটা সরলীকৃত পাঠই করেছেন এ রকম বোধ হয়।

রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রই পূর্ণ সত্যের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তাই তিনি সর্বদাই বিপরীত স্রোতে চলেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে পুঁজির সমৃদ্ধি দেখে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন শোষণ ও বঞ্চনার চলমান চিত্র, মার্কিনদের বিরাগভাজন হয়েও প্রশংসা করেছেন রাশিয়ার গণশিক্ষা, সমবায় ও সাধারণ মানুষের উত্থানের। আবার রাশিয়ায় গিয়ে স্মরণ করেছেন মানবপ্রকৃতির কথা; পরামর্শ দিয়েছেন পরার্থপরতার বেদিতে ব্যক্তিস্বার্থকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য না করতে এবং বারবার বলেছেন পরমতের প্রতি সহিষ্ণু হতে। পারস্যে গিয়ে তিনি স্মরণ করেছেন হাফিজ ও সাদীকে এবং নিজেকে তাঁদেরই দলের একজন হিসেবে পরিচয় করাচ্ছেন। কিন্তু

তখনো ইউরোপের কাছে ঋণ স্বীকারে পিছপা হননি। প্রাচীন সভ্যতা পারস্যও তাঁর চোখে ছিল 'নো-নেশন', তাদের প্রতি তাঁর সম্ভাষণ তাঁর নিজ দেশের মানুষের জন্যও প্রযোজ্য হতে পারত :

> আমি বললুম, আপনাদের পূর্বতন সূফীসাধক কবি ও রূপকার যাঁরা আমি তাঁদেরই আপন, এসেছি আধুনিক কালের ভাষা নিয়ে; তাই আমাকে স্বীকার করা আপনাদের পক্ষে কঠিন হবে না। কিন্তু নূতন কালের যা দান তাকেও আমি অবজ্ঞা করি নে। এ যুগে য়ুরোপ যে সত্যের বাহনরূপে এসেছে তাকে যদি গ্রহণ করতে না পারি তা হলে তার আঘাতকেই গ্রহণ করতে হবে। তাই বলে নিজের আন্তরিক ঐশ্বর্যকে হারিয়ে বাহিরের সম্পদকে গ্রহণ করা যায় না। যে দিতে পারে সেই নিতে পারে, ভিক্ষুক তা পারে না। (*পারস্যে, রবীন্দ্র রচনাবলী*)

বোঝাই যায়, চরম পন্থা পরিহার করে রজ্জুপথেই চলেছেন রবীন্দ্রনাথ : ইউরোপের দিকে জানালাও খুলে দিতে বলছেন, আবার অন্তরের ঐশ্বর্যও রক্ষা করতে বলছেন। এ ধরনের মধ্যম পন্থার ক্ষেত্রে ভুল বোঝার আশঙ্কা তাই থেকেই যায়।

আবারও পার্থ চ্যাটার্জির মূল অভিযোগে ফিরে আসি। রবীন্দ্রনাথের জীবনের অর্ধেক কেটেছে উনিশ শতকে, অর্ধেক কেটেছে বিশ শতকে। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ দেখে যাননি তিনি। দেখে যাননি যেমন ইউরোপে ওয়েলফেয়ার স্টেটের অভ্যুদয়, তেমনি দেখে যাননি ঠান্ডা যুদ্ধের পরিণতি, বার্লিন ওয়ালের পতন এবং একক সুপার সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্ব। ফুকোর ধাঁচের আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র দেখে যাননি, এ-ও ঠিক। কিন্তু খুব বেশি কেউ আজ দাবি করবে না যে, আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে ক্ষমতাতন্ত্রের যে বিস্তার আমরা এখন দেখছি, তাতে ধ্রুপদি পুঁজিবাদের কোনো সারবস্তু নিহিত নেই বা আধুনিক পুঁজিবাদ তার শোষণতন্ত্র হারিয়ে হয়ে উঠছে সর্বতোভাবে জনকল্যাণমুখী। পুরোনো ক্ষমতাতন্ত্রের যেটুকু রবীন্দ্রনাথ বিচার করে গেছেন তাঁর লেখা পত্রে, তার প্রাসঙ্গিকতা নতুন ক্ষমতাতন্ত্রের আলোচনায় আজও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যায়নি এবং এ কারণেই রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক বিচার এখনো আমাদের কালের পুঁজিবাদ ও তার নেশনব্যবস্থা (বাইরের থেকে ও ভেতরের থেকে) বোঝার জন্য যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক থেকে গেছে।

*রক্তকরবী*র দৃষ্টান্তই আমাদের চোখের সামনে রয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে আমাদের বড় সূত্র হচ্ছে *রক্তকরবী* প্রসঙ্গে লেখকের নিজস্ব টিকা-ভাষ্য, যা 'অথরস ইন্টারপ্রিটেশনস' হিসেবে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে তাঁর বলার প্রধান প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'দ্য পার্সোনাল মেন ইজ নট ডেড, অনলি ডোমিনেটেড বাই দি অর্গানাইজড মেন'। *রক্তকরবী* প্রসঙ্গেই তিনি লিখেছেন :

> When men make use of men they use every variety of machinery to fortify themselves or their selfish ends against the dissolving power of beauty and love,—the trust, the company, stocks and shares, investments, machinery through which they can avoid all human connection and so cut themselves off from their fellows whilst they extract for their benefit the very essence of the lives of their neighbors, organizations are set up with the best of aims and ideals and of executive machinery...In such organization men have become numbers.

এখানে কি আমরা মার্ক্সেরই ছায়াপাত দেখতে পাচ্ছি না? পার্থ নিজেই কি অন্যত্র বলেননি যে পুঁজিবাদ তাঁর বিঘোষিত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ছে? তাহলে রবীন্দ্রনাথের নেশন-স্টেটের সমালোচনা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে কোন সূত্রে? একই কথাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন *ন্যাশনালিজম* প্রবন্ধগুচ্ছে। সেখানে পুঁজিপতিদের উদ্দেশে তিনি যা বলেছেন, তার বিশদ আলোচনা করেছেন শঙ্কর শীল *বিশ্বায়ন ও রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থে। আমরা এখানে শুধু প্রাসঙ্গিক অংশটি তুলে দিলাম, যেখানে রবীন্দ্রনাথ সর্বজনীন প্রশাসনিকতার মায়াজাল ছিন্ন করে দিচ্ছেন লোকসমক্ষে। পুঁজিপতিদের উদ্দেশে তিনি বলছেন :

> You who live under the delusion that you are free, are every day sacrificing your freedom and humanity to this fetish of nationalism, living in the dense poisonous atmosphere of world-wide suspicion and greed and panic.

আধুনিক পুঁজিবাদ যা বলছে, সে আসলে তা নয়। নেশনের সমালোচনা আজকের যুগের পুঁজিবাদের নানা অমানবিক দিকের সমালোচনারই অন্য একটি পাঠ। বার্লিন দেয়ালের পতনের দুই দশকে 'ইতিহাসের পরিসমাপ্তি' হয়ে যায়নি। ইউরোপ ও অন্যত্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে উনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদ (রুয়ান্ডা বা বসনিয়ার গণহত্যা আমরা ভুলে যাই কী করে?)। নাইন-ইলেভেনের পরের পৃথিবীতে মিথ্যাচারের ভিত্তিতে পরিচালিত ইরাক যুদ্ধ ও আফগানিস্তানে রক্তক্ষয়ী অবক্ষয় 'সর্বজনীন প্রশাসনিকতা'কে নির্দেশ করে না। কোন অভিজ্ঞতার নিক্তিতে তবে আমরা রবীন্দ্রনাথের নেশন-ভাবনাকে 'অবান্তর' বলে পরিহার করব? পার্থ চ্যাটার্জির সঙ্গে এ প্রশ্নে সহমত হওয়া গেল না।

নো-নেশনের সমাজ

নেশন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা যতটা স্পষ্ট, 'নো-নেশন' যারা, তারা কীভাবে নেশনকে এড়িয়ে নতুন সমাজ গড়বে, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা তুলনায় বড় বেশি সংক্ষিপ্ত। আমরা কিছু সংকেত হয়তো পাই, হয়তো পাই কিছু

তাৎপর্যপূর্ণ বিকল্প চিত্রকল্প, কিন্তু তাতে করে নো-নেশনের সমাজের পুরো চিত্রটা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে না। নেশনের সমালোচনা করতে গিয়ে সময় সময় তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষের উদাহরণ টেনে আনেন। স্মরণ করেন পুরাকালের কোনো প্রথা, প্রতিষ্ঠান বা লোকাচার, দৃষ্টি আকর্ষণ করেন পল্লিসমাজ পুনর্গঠনের প্রতি, বৌদ্ধধর্মের আলোচনার সূত্রে স্মরণ করেন নগরসভ্যতার অবদান, রাষ্ট্রের ভূমিকার (যেমন—শিক্ষা বিস্তারে) কথাও এ সূত্রে চলে আসে। এই অস্পষ্টতা মার্ক্সের সমাজতন্ত্রবিষয়ক ধারণার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। যে অর্থে মার্ক্স পুঁজিবাদের ঘনিষ্ঠ সমালোচনার পরও নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকল্প চিত্র রেখে যেতে পারেননি ('ক্রিটিক অব দ্য গোথা প্রোগ্রামে' আমরা যা পাই, তা শুধু কিছু মৌল নীতির সারসংক্ষেপ), ঠিক একই অর্থে রবীন্দ্রনাথের লেখায় নেশন বা ন্যাশনালিজমের সুতীক্ষ্ণ সমালোচনার পরও পাই না নো-নেশন সমাজের কোনো পূর্ণাঙ্গ অবয়ব। এ মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে আমরা হয়তো কয়েকটি মৌল নীতি উদ্ধার করার চেষ্টা করতে পারি, যার প্রাসঙ্গিকতার চূড়ান্ত বিচার হতে পারে কেবল আগামী দিনের অনুশীলন ও তত্ত্বচর্চায়।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে রবীন্দ্রনাথ নেশন ও নেশন-স্টেটের সমালোচনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ভূমিকা অস্বীকার করেননি। তাঁর উদ্বেগ ছিল, ইংরেজ চলে যাওয়ার পর যে রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটবে তার চরিত্র নিয়ে। বলা বাহুল্য, দেশের স্বাধীনতা চাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সম্মুখ সারিতে, কিন্তু অন্যদের থেকে তাঁর চাওয়ার ভিন্নতাও ছিল, 'আমরা যখন বলি স্বাধীনতা চাই তখন কী চাই, সেটা ভেবে দেখা চাই।...যখন দেশের স্বাধীনতা চাই, তখন নেতিসূচক স্বাধীনতা চাই নে, তখন দেশের সকল লোকের সঙ্গে সম্বন্ধকে যথাসম্ভব সত্য বাধামুক্ত করতে চাই। সেটা হয় ভেদের কারণ দূর করে দিয়ে, কিন্তু সে কারণ ভিতরেও থাকতে পারে, বাইরেও থাকতে পারে' ('সমস্যা', *কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী*, পৃ. ৫৯৮-৫৯৯)। ঐক্য রাখার প্রয়োজনে তিনি 'ভারতবর্ষে এক রাষ্ট্র শাসন না হয়ে যুক্তরাষ্ট্র শাসননীতির প্রবর্তন' হোক, এটা মেনে নিয়েছিলেন ('হিন্দু-মুসলমান', *কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী*, পৃ. ৬৬৮)। অন্যত্র বলেছেন, 'দেখতে পেলেম প্রাচ্য জাতিরা নবযুগের দিকে যাত্রা শুরু করেছে।' এ ক্ষেত্রে প্রথমেই তাঁর মনে এল জাপানের কথা যার ন্যাশনালিজমকে ইতিপূর্বেই তিনি সমালোচনা করেছেন, 'বহুকালের সুপ্ত এশিয়ায় দেখা দিল জাগরণের উদ্যম। পাশ্চাত্যেরই সংঘাতে সংস্রবে জাপান অতি অল্পকালের মধ্যেই বিশ্ব জাতিসংঘের মধ্যে জয় করে নিলে সম্মানের অধিকার। অর্থাৎ জাপান বর্তমানকালের মধ্যেই বর্তমান, অতীতে ছায়াচ্ছন্ন নয়, সে তা সম্যকরূপে প্রমাণ করল' (*কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী*, পৃ. ৫৪০-৫৪১)। নো-

নেশনের সমাজের জন্য প্রাচীন ভারতবর্ষে উদাহরণ খোঁজার চেয়ে দৃষ্টান্ত খুঁজেছেন ভারতবর্ষের বাইরে—চীন, জাপান, পারস্য, তুরস্ক: 'ভারতবর্ষ যে কোনখানে সত্য, নিজের লোহার সিন্ধুকের মধ্যে তার দলিল সে রেখে যায় নি।...আজ ভারতবর্ষের ভিতরে বসে ধূলিকলুষিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে যা দেখি তার চেয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে ভারতবর্ষের নিত্যকালের রূপ দেখতে পাব ভারতবর্ষের বাইরে থেকে।' তা ছাড়া অশোক ও আকবর শাসনের ছকও দৃষ্টান্ত হিসেবে ছিল তাঁর নো-নেশনের সমীকরণের সামনে।

নো-নেশনের সমাজে রাষ্ট্রের পরিধি কতটুকু হবে, এ নিয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল। তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল লোকসমাজের প্রতি। আজকের যুগে রাষ্ট্র বনাম সিভিল সোসাইটির আধুনিক বিতর্কে তাঁর সমর্থন থাকত শেষোক্ত খাতের প্রতি, এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায়; এবং এ কারণেই 'স্বদেশী সমাজ' থেকে বলে আসছিলেন, ইউরোপের সভ্যতা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আর আমাদের সভ্যতা সমাজকেন্দ্রিক। যে কাজ সমাজের করার, সেটা সমাজকেই করতে হবে এবং ক্রমেই রাষ্ট্রের কাজের পরিধি কমিয়ে আনতে হবে, এ কথা বিভিন্ন পর্যায়ের প্রবন্ধে ঘুরেফিরে বলেছেন। স্পষ্টতই, নো-নেশনের সমাজ হবে বলিষ্ঠ সিভিল সোসাইটির সমাজ। রাষ্ট্র নয়, পুরো সমাজই হবে নো-নেশনের প্রাণশক্তি। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রবিরোধী চিন্তায় যেমন গ্রামসির, তেমনি নেশনবিরোধী ভাবনায় পরবর্তী যুগের হাবেরমাসের পূর্বলেখ এখানে দেখতে পাই।

নো-নেশনের সমাজের একটা প্রধান অবলম্বন হবে সমগ্র জনসাধারণের উদ্ভাবনী শক্তি—সেটা কী বাইরে থেকে আইডিয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে, কী ভেতর থেকে নতুন আইডিয়াকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে। অন্ধ অনুকরণের প্রতি তাঁর কোনোকালেই সায় ছিল না। 'পলিটিক্যাল আত্মপরিচয়' খোঁজার তাড়ায় আমাদের 'স্বপ্নে গড়া ম্যাটসিনি, স্বপ্নে গড়া গারিবলডি, কাল্পনিক ওয়াশিংটন বলে' চিন্তা করার রাস্তা থেকে সরে আসতে বলছেন তিনি। তেমনি 'অর্থতত্ত্বেও' বলছেন বলশেভিজম, সিন্ডিক্যালিজম, সোশ্যালিজমের 'গোলকধাঁধা' থেকে বেরিয়ে যেতে। কেননা, 'এ-সমস্তই মরীচিকার মতো, ভারতবর্ষের চিরকালীন জমির উপরে নেই—আমাদের দুর্ভাগ্যতাপদগ্ধ হাল আমলের তৃষার্ত দৃষ্টির উপরে স্বপ্ন রচনা করছে। এই স্বপ্ন-সিনেমার কোণে কোণে মাঝে মাঝে Made in Europe-এর মার্কা ঝলক মেরে এর কারখানাঘরের বৃত্তান্তটি জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে' ('বৃহত্তর ভারত', *কালান্তর*, রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ, পৃ. ৬১৭, ১৩৯৭ বাংলা)। নিজের উন্নয়নের ছক নিজে খুঁজে বের করার সাহসে বিশ্বাস করতেন তিনি।

নো-নেশনের সমাজে প্রথাগত অর্থে পার্টি পলিটিক্স তথা রাজনীতির ভূমিকা নিয়েও তাঁর কিছু নিজস্ব বক্তব্য ছিল। রাজনীতিকে তিনি ততটাই গুরুত্ব দিয়েছেন, যতটা তা সামাজিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে। এ জন্যই বলছেন, 'সমগ্র দেশ বলে একটি জিনিস সমস্ত দেশের লোকের সৃষ্টি; এ সৃষ্টি তার সমস্ত হৃদয়বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি ইচ্ছাশক্তির প্রকাশে।...পোলিটিক্যাল যোগ বা ইকনমিক যোগ পূর্ণ যোগ নয়, সর্বশক্তির যোগ চাই। অন্য দেশের ইতিহাস যখন লক্ষ করে দেখি তখন পোলিটিক্যাল ঘোড়াটাকে সকলের আগে দেখি, মনে মনে ঠিক করি ঐ চতুষ্পদটারই টানে সমস্ত জাত এগিয়ে চলেছে। তখন হিসাব করে দেখি নে, এর পিছনে দেশ বলে যে গাড়িটা আছে সেটা চলবার যোগ্য গাড়ি, তার একচাকার সঙ্গে আর-এক চাকার সামঞ্জস্য আছে' ('সত্যের আহ্বান', *কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী*, পৃ. ৫৮৯)।

আধিপত্যকারী আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। যদিও ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রকে লক্ষ্য করে বলা, তবু সে পাঠ থেকে তাঁর পক্ষপাতিত্ব কোথায়, সেটা কিছুটা আঁচ করা যায়। তাঁর মনে হয়েছে, আমলাদের কাছে গোটা দেশ 'একটা অতি প্রকাণ্ড সরকারি বা সওদাগরি আপিস'। সেই সঙ্গে যোগ করছেন, 'ভারত-দফতরখানার বহুকাল ক্রমাগত সংস্কারের অ্যাসিডে কাঁচা বয়স হইতে জীর্ণ হইয়া যে একটি আমলা সম্প্রদায় আমাদের পক্ষে কৃত্রিম মানুষ হইয়া আছে আমরা তাহারই প্রজা' এদের কাছে ভারতবর্ষ 'স্তূপাকার স্ট্যাটিস্টিক্সের সমষ্টি' ('ছোটো ও বড়ো', *কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী*, পৃ. ৫৫৯-৫৬০)। উত্তর-উপনিবেশ রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রের ক্ষেত্রেও এটা বলা যেতে পারত।

মুক্তধারা নাটকের মতোই নো-নেশনের সমাজ পরিবেশের সঙ্গে শ্রীবৃদ্ধির সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলবে। *পল্লীপ্রকৃতি* গ্রন্থে তিনি বলছেন, 'মানুষ গৃধ্নুভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে, প্রকৃতির সহজ দানে কুলোয়নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ হয়েছে।...এ সমস্যা আজ শুধু এখানে নয়, মানুষের সর্বগ্রাসী লোভ থেকে অরণ্যসম্পদকে রক্ষা করা সর্বত্রই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।...বিধাতার যা কিছু কল্যাণের দান, আপনার কল্যাণ বিস্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করেছে।' অন্যত্র 'ভূসম্পদের বিত্তহরণ' প্রবন্ধে (মূল লেখাটি ইংরেজিতে; আমি এখানে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ ব্যবহার করছি) রবীন্দ্রনাথ ভূসম্পদের লুণ্ঠনের সঙ্গে বিত্তশালী শ্রেণীর অভ্যুদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করেন। এ পরিস্থিতিতে 'ক্ষমতার সংকীর্ণ আকাঙ্ক্ষা তখন জীবনের রিপাবলিকে আধিপত্য করতে থাকে।...একটা সমাজে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর লোভকে যখন অপরিমিত মাত্রায় বাড়তে দেওয়া

হয় এবং অন্যের দ্বারা তা প্রবুদ্ধ ও প্রোৎসাহিত হতে থাকে, তখন পশ্চিমের দেশে যাকে গণতন্ত্র বলে, তার রূপায়ণ আর সম্ভব হয় না।...আপন আকাঙ্ক্ষা পূরণ আর স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দখল করতে চায়। গণতন্ত্রের তখন একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায় ধনীদের আনন্দ-বিহারের হস্তীবাহন হয়ে ওঠা। আমাদের কাছে দারিদ্র্যটা তত বড় সমস্যা নয়; তার চেয়েও বড় সমস্যা হল মানুষের জীবন থেকে সুখশান্তি হারিয়ে যাওয়া। এখনকার দিনে উৎপাদনের অর্থ দাঁড়িয়েছে সম্পদের অনুসন্ধান এবং আহরণ। এই প্রক্রিয়া মানুষকে নির্দয়ভাবে ব্যবহার করে।' পৃথিবী থেকে প্রাণশক্তি বিনষ্ট করে দিয়ে কিছুদিনের জন্য কেবল অর্থনীতি বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এর স্থায়িত্বশীলতা নেই। নো-নেশনের সমাজে তাই ইকোলজিক্যাল রিজন হবে অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি।

রবীন্দ্রনাথ কলের মধ্যে কোনো সদ্‌গুণ দেখতেন না, এমন অভিযোগও অমূলক। 'সমবায় নীতি'তে লিখেছেন, 'কেউ কেউ বলেন, মানুষের ব্যবহার থেকে যন্ত্রগুলোকে একেবারে নির্বাসিত করলে তবে আপদ মেটে। এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। মানুষের কর্মশক্তির বাহনযন্ত্রকে যে জাতি আয়ত্ত করতে পারেনি, সংসারে তার পরাভব অনিবার্য।' অর্থাৎ নো-নেশনের সমাজে প্রযুক্তির ব্যবহার থাকবে সভ্যতার বিকাশের ধারার সঙ্গে সংগতি রেখে, তবে এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তির 'বিষদাঁত' আগে 'উপড়ে ফেলা চাই'। বিষদাঁতটা কোথায় তার ব্যাখ্যাও দিলেন, 'যন্ত্রের বিষদাঁত যদি কোথাও থাকে, তবে সে আছে আমাদের লোভের মধ্যে। রাশিয়া এই বিষদাঁতটাকে সজোরে উপড়াতে লেগেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে যন্ত্রকে সুদ্ধ টান মারেনি। উল্টো, যন্ত্রের সুযোগকে সর্বজনের পক্ষে সম্পূর্ণ সুগম করে দিয়ে লোভের কারণটাকেই সে ঘুচিয়ে দিতে চায়।' তাই কলের চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর মতোই প্রাগ-আধুনিক—এ রকম ধারণা মানা গেল না।

রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র দেখে আসার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নো-নেশনের অর্থব্যবস্থা নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করেছিল। সেখানে তিনি যেমন দেখে এসেছিলেন যৌথতার নতুন নির্মাণ—গণশিক্ষা, সমবায়নীতি, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের 'সাধনা'—তেমনি তাঁর কাছে মনে হয়েছিল, সমাজ কেবল পরার্থপরতা ও যৌথতার ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে না। এখানে ব্যক্তিস্বার্থেরও (আজকের ভাষায় 'ইনসেনটিভ'-এর) মেলবন্ধন চাই। রবীন্দ্রনাথ এখানে সমস্যা দেখছেন, 'মানবচরিত্রের মধ্যে। নিজের সম্পত্তির প্রতি নিজের মমতা, ওটা তর্কের বিষয় নয়; ওটা আমাদের সংস্কারগত। নিজেকে আমরা প্রকাশ করতে চাই, সম্পত্তি সেই প্রকাশের একটা উপায়।' এর দ্বারা তিনি কত দূর পর্যন্ত সামাজিক মালিকানা

(যৌথ বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা) প্রতিষ্ঠা পাওয়া উচিত সে প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। ব্যক্তিস্বার্থ ও পরার্থপরতা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও যৌথ মালিকানা এ রকম বিপরীতার্থকের মধ্যে মাঝামাঝি কোনো সমাধান খুঁজছিলেন তিনি। *রাশিয়ার চিঠি*তে এ প্রসঙ্গে লিখছেন, 'এর একটা মাঝামাঝি সমাধান ছাড়া উপায় আছে বলে মনে করি নে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্য ছাপিয়ে যাওয়া চাই। তা হলেই সম্পত্তির মমত্ব লুব্ধতার প্রতারণায় বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পৌঁছয় না।...সোভিয়েটেরা এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তাকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। সেজন্যে জবরদস্তির সীমা নেই।...আত্ম এবং পর উভয়কেই স্বীকার করে তবেই তার সমাধান সম্ভব।'

এসব কথা যখন লিখছেন, রাশিয়ায় তখন চলছে যৌথভাবে খামার প্রতিষ্ঠার অভিযান। তখন সেখানে প্রচুর 'জবরদস্তি' হয়েছিল, সে ইতিহাস এখন আমাদের কাছে আর অজানা নেই। এসব কথা যখন লিখছেন, তখন স্তালিনের 'দ্রুত সমবায়ীকরণ' মতের সঙ্গে বুখারিনের 'ধীরে চলো' নীতির ঘোরতর বিরোধ বেধে গেছে। রাশিয়ার সাম্প্রতিক পরিবর্তন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সব সময় খবর রাখতেন। তাঁকে জানানোর মতো দেশি-বিদেশি উৎসের সংখ্যা সেকালেও কম ছিল না (তা ছাড়া সৌমেন্দ্রনাথ তো ছিলেনই)। রাশিয়া সম্পর্কে লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ অর্থনৈতিক মতাদর্শের যে যুক্তি দেখালেন, তাতে করে তাঁকে স্পষ্টতই বুখারিন ধারার পক্ষে ও স্তালিনবিরোধী বলে মনে হয়। হয়তো এ ক্ষেত্রে তিনি নো-নেশনের নতুন সমাজব্যবস্থার কাছে আরও বেশি মানব-প্রকৃতিমুখিন বাস্তবানুগ প্রয়োগ প্রত্যাশা করেছিলেন। সে প্রত্যাশা লেনিনের 'নিউ ইকোনমিক পলিসি' থেকে খুব দূরে নয়।

আমি এমনটাও ভাবি যে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রবিরোধী চিন্তা, তাঁর ন্যাশনালিজমের সমালোচনা, তাঁর নো-নেশনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তাঁকে মার্ক্সের সন্নিকটেও নিয়ে যায়, যেখানে মার্ক্স বলেছিলেন একপর্যায়ে 'রাষ্ট্রের ক্রমবিলুপ্তি'র কথা। রবীন্দ্রনাথের নো-নেশন প্রকল্প সমাজের ওপর গুরুত্ব দিয়ে, রাষ্ট্রের মানবিকীকরণ চেয়ে, স্বার্থ ও নিঃস্বার্থের সমীকরণ করে মানবসত্তার যে চরম বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন, তা মার্ক্স-কথিত 'রাষ্ট্রের ক্রমবিলুপ্তি'র ছকেই এগোয়। মার্ক্সের সঙ্গে তাঁর দিব্যি কথোপকথন চলতে পারে কিছু কিছু বিষয়ে 'কাজিয়া' সত্ত্বেও।[৫]

তার পরও রবীন্দ্রনাথকে আমার মনে হয় এ ভূখণ্ডের রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে এক ট্র্যাজিক চরিত্র। তিনি যা বিশ্বাস করেছিলেন তা তিনি অবিশ্রান্তভাবে অকপটে বলেছেন, জরুরি তাগিদ নিয়ে বলেছেন, হয়তো বেশিই বলেছেন সময় সময় এবং কখনো কখনো তাঁর 'এই বলার' সঙ্গে 'ওই বলার' বিরোধ রয়ে গেছে। কিন্তু তার পরও তিনি বিপরীত স্রোতে চলতে গিয়ে পিছপা হননি। এভাবে চলতে গিয়ে তাঁকে ক্রমেই তাঁর সহচরদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়েছে। সে জন্যই তিনি জীবনের উপান্তে নিজেকে দেখেছেন ব্রাত্যহীনের দলে। মোহ-মেঘে আমরাও রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাইনি।

পত্রপুট-এর সেই বিখ্যাত পনেরো নম্বর কবিতায় তিনি এক জায়গায় বলেছেন পরবর্তী যুগের উদ্দেশে :

> আমাকে শুধায়, 'দেখে এলে তোমার দেবতাকে?'
> আমি বলি, 'না।'
> অবাক হয়ে শুনে, বলে, 'জানা নেই পথ?'
> আমি বলি, 'না।'
> প্রশ্ন করে, 'কোনো জাত নেই বুঝি তোমার?'
> আমি বলি, 'না।'

সেই যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখেছিলেন চিরকাল পথের ধারে বসে থাকার সংকল্পের কথা, সেভাবেই যেন চিরটা কাল স্বরচিত মত আঁকড়ে থেকে পথের ধারেই থেকে গেলেন।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি লিখেছিলেন ১৩১২ সনের ২৬ অঘ্রান। পরে ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে *বঙ্গবাসী*তে এটি ছাপা হয়। উদ্ধৃত হয়েছে, নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২১, দে'জ পাবলিশিং।

২. এ নিয়ে আলোচনা করেছেন অনেকেই, তবে সবচেয়ে বিশদভাবে করেছেন নেপাল মজুমদার তাঁর *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থে। এসবের প্রভাবে দুই দশক আগে আমি এ নিয়ে কিছুটা আলোচনার প্রয়াস পেয়েছিলাম। দেখুন, 'ভদ্র সম্প্রদায় বনাম লোকসাধারণ : স্বদেশি সমাজ প্রকল্পে রবীন্দ্রনাথ', *সংবাদ* সাহিত্য সাময়িকী, ১৯৯১; 'জাতীয়তাবাদ কি আবশ্যক', *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক*, ১৯৯৮।

৩. এ নিয়ে সাম্প্রতিক আলোচনার জন্য দেখুন, আনিসুজ্জামান, 'রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ববঙ্গের অন্তর্লোক', *দেশ*, ২ মে ২০১১; সেই সঙ্গে দেখুন, ভূঁইয়া ইকবাল, *রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ*, প্রথমা প্রকাশন, ২০১০।

৪. এ রকম আশঙ্কার কথা আসলে দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে বলে আসছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই স্বদেশি আন্দোলনের যুগেই ১৩১৫ সনের আষাঢ় মাসে তিনি *প্রবাসী* পত্রিকায়